International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 199-209
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.212

সাংখ্য দর্শনে দৃষ্ট-প্রমাণ: একটি বিশ্লেষণ

মহুয়া চৌধুরী
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 01.03.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Human experience is of two kinds: pleasure and pain. All human beings seek happiness and desire liberation from suffering. The ancient Indian philosophical system of sāṃkhya asserts that the most distressing experience in human life is suffering (duḥkha). Therefore, liberation from suffering becomes the highest goal of life. According to the Sāṃkhya philosophers, the knowledge of the twenty-five principles (pañcaviṃśati tattva)- that is, the discriminative knowledge of the manifest (vyakta), the non-manifest (avyakta), the knower (jña or puruṣa)- is the only means for the complete cessation of suffering and the attainment of liberation (kaivalya).

However, no rational person aspires to attain any object unless it is established through valid means of knowledge (pramāṇa) and freed from doubt. Hence, the twenty-five principles accepted in sāṃkhya must be validated through appropriate pramāṇas. The accepted pramāṇas of any Indian philosophical system must be adequate to establish all its objects of knowledge (prameya), and conversely, all its objects of knowledge must be established by its accepted pramāṇas. Indeed, without the valid establishment of objects through pramāṇa, liberation or kaivalya cannot be attained.

Sāṃkhya accepts three pramāṇas— perception (pratyakṣa or dṛṣṭa), inference (anumāna), and verbal testimony (śabda). Among these, perception holds primary importance because inference and verbal testimony ultimately depend upon it, either directly or indirectly. Though perception immediately establishes only manifest entities, it serves as the foundational basis of all knowledge. This paper analytically examines the nature of perception within the sāṃkhya epistemology, as described in the earliest extant text, the sāṃkhyakārikā, along with its classical commentaries such as the Sāṃkhyatattvakaumudī and the Yuktidīpikā.

Key Words: Pramā, Pramāṇa, Perception (Dṛṣṭa or Prtyakṣa pramāṇa), Ālocana-jñāna/Nirvikalpaka-jñāna (Indeterminate Cognition), Savikalpaka-jñāna (Determinate Cognition).

ভূমিকা:

ভারতীয় দর্শন জগতে বিদ্যমান ছয়টি আস্তিক দর্শন-প্রস্থানের অন্যতম হল সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যদর্শনকে প্রাচীনতম দর্শন বলা হয়ে থাকে। সাংখ্যের মূল প্রবক্তা হলেন পরমর্ষি কপিল। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্যের রয়েছে একটি সুদীর্ঘ পরম্পরা। এই সুদীর্ঘ পরম্পরা কপিল-শিষ্য আসুরি, পঞ্চশিখ, বার্ষগণ্য প্রভৃতি আচার্যদের দিয়ে শুরু হয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ, গৌড়পাদ, মাঠর, পরমার্থ, *যুক্তিদীপিকা*-কার, *জয়মঙ্গলা*-

কার, বাচস্পতি মিশ্র, *তত্ত্বসমাসসূত্র*-কার, *সাংখ্যসূত্র*-কার, অনিরুদ্ধ, বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাবগণেশ এবং তাঁরও পরবর্তী বহু আচার্যদের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে।

সাংখ্য দর্শনের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ হল *সাংখ্যকারিকা*। *সাংখ্যকারিকা*- গ্রন্থটি শিষ্য-পরম্পরাক্রমে মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন-পূর্বক আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক বিরচিত। এই গ্রন্থটি ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্য্যা ছন্দে রচনা করেছেন। *সাংখ্যকারিকা* সংস্কৃত ভাষায় সূত্রাকারে রচিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃত ভাষায় অনেক টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি রচিত হয়েছে। যেমন—বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, অজানা লেখক রচিত টীকা *যুক্তিদীপিকা*, গৌড়পাদ রচিত ভাষ্য *গৌড়পাদভাষ্য*, মাঠর রচিত বৃত্তি *মাঠরবৃত্তি* ইত্যাদি। এই প্রতিটি টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এই সমস্ত টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ঐ টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলি পাঠ করলে সূত্রগ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি যৌক্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারণা গঠন করা সম্ভব।

সাংখ্যকারিকা-র অন্যতম টীকাগ্রন্থ *যুক্তিদীপিকা*-য় *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটিকে সূত্রগ্রন্থ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং, *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটি সাংখ্য দর্শনের বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ রূপে বিবেচিত। আলোচ্য প্রবন্ধ-টি যেহেতু *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত সেহেতু *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের ব্যাখ্যার্থে নির্বাচিত দুটি টীকা যথা-বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* ও অজানা লেখক রচিত টীকা *যুক্তিদীপিকা*-কে অবলম্বন করেই প্রবন্ধ-টিতে আলোচনাকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা সকলেই এবিষয়ে অবগত যে, মানুষের জীবনে সবচেয়ে কষ্টকর অনুভূতি হল দুঃখের অনুভূতি। এই দুঃখানুভূতির জন্যই মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে অর্থাৎ মানুষের মনে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* গ্রন্থে বলেছেন, "এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জাগতি ন স্যাৎ"।[১] অর্থাৎ জগতে যদি দুঃখের কোন অস্তিত্ব না থাকত এবং অস্তিত্ব থাকলেও যদি তা ত্যাগের যোগ্য না হত, যোগ্য হলেও যদি তার সম্পূর্ণ-রূপে নাশ সম্ভব না হত, তবে সাংখ্য শাস্ত্র বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগত না। তিনি বলেছেন, "তত্র ন তাবদ্দুঃখং নাস্তি নাপ্যজিহাসিতমিত্যুক্তং দুঃখত্রয়াভিঘাতাদিতি"।[২] অর্থাৎ এই বাক্যের দ্বারা একথা স্পষ্ট যে জগতে দুঃখ নেই এবং দুঃখ পরিত্যাগ করা যায় না—এমন নয়। সাংখ্য দর্শনের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ *সাংখ্যকারিকা*-র প্রথম কারিকায় এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে সমস্ত জীবকূল ত্রিবিধ দুঃখ-তাপ ভোগ করে। "তৎ খলু আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ"।[৩] অর্থাৎ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে এই ত্রিবিধ দু:খ হল— (ক) আধ্যাত্মিক দুঃখ, (খ) আধিভৌতিক দুঃখ এবং (গ) আধিদৈবিক দুঃখ।

সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব; যথা— পুরুষ বা জ্ঞ, অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ; পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ আকাশ বা ব্যোম্, মরুৎ বা বায়ু, তেজ বা অগ্নি, অপ্ বা জল, ক্ষিতি বা পৃথিবী। সাংখ্য দর্শনে এই পঁচিশটি তত্ত্বের জ্ঞান তথা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর ভেদজ্ঞানকেই জীবের সকল দুঃখের চিরনিবৃত্তির উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ৮*

[২] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ১০*

[৩] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ১০*

এখন কোন বিষয় প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হলে অর্থাৎ সংশয়াদিমুক্ত না হলে কোন বিবেচক ব্যক্তি সেই বিষয় লাভের জন্য আগ্রহী হন না। কাজেই সাংখ্য দর্শন স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-কে প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। সুতরাং পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিশ্লেষণের পূর্বে প্রমাণতত্ত্ব প্রতিপাদিত হওয়া আবশ্যক। তাই বলা যেতে পারে, সাংখ্য দর্শনে প্রমাণতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

সাংখ্যদর্শনে প্রমা ও প্রমাণ:

প্রমার অসাধারণ কারণকেই বলা হয় প্রমাণ। তবে যে কোন জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলা যায় না। 'প্রমা' শব্দে যে 'প্র' উপসর্গটি আছে তা প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যথার্থ 'মা' বা জ্ঞানের প্রতীক। কাজেই ভ্রম জ্ঞানের সাধনকে প্রমাণ বলা যাবে না। প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞানের সাধনকেই প্রমাণ বলতে হবে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে প্রমার স্বরূপ জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে যথার্থ জ্ঞানের বা প্রমার সংজ্ঞা ও বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি। তিনি কেবলমাত্র যথার্থ জ্ঞানের উৎস-এর সংখ্যা বিবৃত করেছেন। এই কারণে *সাংখ্যকারিকা*-র অন্যতম টীকাগ্রন্থ *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*-তে বাচস্পতি মিশ্র *সাংখ্যকারিকা*-র চতুর্থ কারিকার ব্যাখ্যায় প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগত বিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা"[৪]

অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ, অবিপরীত ও অনধিগত বিষয়ের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ বলে এবং প্রমাণের পুরুষনিষ্ঠ বোধরূপ ফলই প্রমা। "বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা"[৫] এই বাক্যের দ্বারা বাচস্পতি বলতে চেয়েছেন, চৈতন্যপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি তথা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই প্রমা শব্দের মুখ্য অর্থ। এই প্রমার সাধন বা করণই প্রমাণ, যাকে অন্তঃকরণবৃত্তি বা জ্ঞান শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। অন্ত:করণের বিষয়াকারে পরিণামকে বৃত্তি বা জ্ঞান বলা হয়।

বাচস্পতি তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* নামক টীকাগ্রন্থে প্রমাণের লক্ষণে বলেছেন—

"অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগত-বিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ প্রমাণম্"।[৬]

উক্ত প্রমাণের লক্ষণের প্রথম বিশেষণের দ্বারা সংশয়ে, দ্বিতীয় বিশেষণের দ্বারা বিপর্যয়ে বা ভ্রমে এবং তৃতীয় বিশেষণের দ্বারা স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং, সংশয়, বিপর্যয় বা ভ্রম এবং স্মৃতি বহির্ভূত বিষয়ের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিকেই প্রমাণ বলে। এইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তে প্রতিবিম্বিত পুরুষ হল প্রমা।

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ যথার্থ জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ-এর সংখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-এর চতুর্থ কারিকায় বলেছেন—

"দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি।।"

অর্থাৎ উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি ইত্যাদি সকল প্রকার প্রমাণ দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচনের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় সাংখ্য শাস্ত্রে কেবলমাত্র এই তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত। যথা— দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা আগম প্রমাণ। এই ত্রিবিধ প্রমাণ আমাদের মত সাধারণ লোকেদের জন্য হওয়ায় এই প্রমাণগুলি লৌকিক প্রমাণ নামে খ্যাত। বস্তুত এই তিন-প্রকার প্রমাণ ছাড়াও আর্যবিজ্ঞান বা প্রাতিভ জ্ঞান নামে একপ্রকার জ্ঞানের কথা বাচস্পতি উল্লেখ করেছেন যা অজ্ঞ জনসাধারণের আওতার বাইরে। এই প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হলেন উর্ধ্বস্রোতা

[৪] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ৪০-৪১*
[৫] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ৪১*
[৬] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ৪১*

যোগী। এই প্রাতিভ জ্ঞান প্রমাণের সংখ্যার মধ্যে উল্লিখিত হয়নি কারণ ঐরূপ জ্ঞানে অজ্ঞ জনসাধারণের কোন অধিকার নেই। সাধারণ লোককে যথার্থ জ্ঞান দেওয়ার জন্যই সাংখ্য শাস্ত্র, কেননা শাস্ত্রে অজ্ঞজনই অধিকারী।

প্রমাণের বিভাগ বলার পর প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ বলতে প্রবৃত্ত হয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থে প্রথমেই দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কেন তিনি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষের লক্ষণটি তুলে ধরেছেন। এর উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*-তে বলেছেন— "প্রত্যক্ষস্য সর্বপ্রমাণেষু জ্যেষ্ঠত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চানুমানা-দীনাং সর্ববাদিনামবিপ্রতিপত্তেশ্চ"।[৭] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ, সকল প্রমাণের পূর্ববর্তী প্রমাণ এবং সকল প্রমাণের উপজীব্য। সাংখ্য দর্শনে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ব্যতীত আরো যে দুটি প্রমাণ স্বীকৃত অর্থাৎ অনুমান ও আপ্তবচন বা শব্দ, সেই প্রমাণ দুটিও দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অধীন। কেননা, (ক) ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হবার পরই অনুমান হয় এবং (খ) শব্দ প্রত্যক্ষ হলে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। অনুমান প্রমাণ এবং শব্দ বা আগম প্রমাণ সাক্ষাৎ ভাবেই হোক বা পরোক্ষ ভাবেই হোক দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া অনুমান, শব্দ ইত্যাদি প্রমাণের অস্তিত্ব বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত।

সাংখ্যমতে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ:

ঈশ্বরকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে প্রত্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ না করে দৃষ্ট শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বুঝিয়েছেন। সাংখ্যমতে প্রমাণ মাত্রই চিত্তবৃত্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণামকে চিত্ত বলা হয়। এখন যদি সকল প্রমাণই চিত্তবৃত্তিরূপ হয়, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিশেষত্ব কি? কাজেই কোন্ চিত্তবৃত্তি দৃষ্ট হবে তা নির্দেশ করার জন্যই আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের* পঞ্চম কারিকায় দৃষ্টের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন— "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্"। অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* নামক টীকাগ্রন্থে দৃষ্টের লক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রথমে 'বিষয়' শব্দের অর্থ নির্দেশ করে পরে 'প্রতি' ও 'অধ্যবসায়' শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন। বিষয় হল তাই যা স্বকীয় আকারের দ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তিকে আকারিত করে প্রত্যক্ষের যোগ্য করে তোলে। বাহ্য বিষয় হল পৃথিবী ইত্যাদি এবং আন্তর বিষয় হল সুখাদি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাংখ্য দর্শনে যেমন প্রত্যক্ষযোগ্য স্থূল বিষয় স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদি বিষয়ও স্বীকার করা হয়েছে। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের মত সাধারণ লোকের নিকট প্রত্যক্ষযোগ্য না হলেও যোগী অর্থাৎ উর্ধ্বস্রোতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বা হতে পারে। সুতরাং, বিষয় বলতে যেমন আমাদের মত অযোগীদের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়কে বোঝায় তেমনি যোগীদের প্রত্যক্ষযোগ্য সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদি বিষয়কেও বোঝায়। এই সকল বিষয়ের প্রতি যার বৃত্তি তাকে প্রতিবিষয় বলা হয় অর্থাৎ "বিষয়ং বিষয়ং প্রতি বর্ততে ইতি প্রতিবিষয়ম্"।[৮]

এখানে বৃত্তি শব্দের অর্থ হল সন্নিকর্ষ— "বৃত্তিশ্চ সন্নিকর্ষঃ"। প্রতিটি বিষয়ের সাথে যার সন্নিকর্ষ হয় বা হতে পারে এমন ইন্দ্রিয়ই হল প্রতিবিষয় শব্দের অর্থ। দৃষ্টের লক্ষণ মধ্যস্থিত 'অধ্যবসায়' শব্দের অর্থ হল নিশ্চয় বা জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে অন্তঃকরণের যে বিষয়াকার পরিণাম হয় সেই বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণবৃত্তিকে অধ্যবসায় বলা হয়। প্রতিবিষয়ে—ইন্দ্রিয়ে যে অধ্যবসায় হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে বুদ্ধির যে পরিণাম বা জ্ঞান হয় তাকেই দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। অন্তঃকরণের বৃত্তি

[৭] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* পৃ. ৪৪

[৮] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ৪৬*

বা অধ্যবসায় অচেতন হলেও ঐরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাণে চৈতন্যময় পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতন হয়। তার ফলে অন্তঃকরণের ধর্মকে পুরুষ স্বীয় ধর্ম বলে মনে করে, এবং তখন পুরুষের 'অহং জানামি' এরূপ অভিমান হয়। এই অভিমানই ঐ প্রমাণের ফল।

এই বিষয়ে *সাংখ্যকারিকা*-র বিংশতি সংখ্যক কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

"তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বেঽপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।।"

অর্থাৎ অন্তঃকরণাদির সাথে পুরুষের সংযোগবশত অন্তঃকরণাদি চেতনার মতো মনে হয় এবং কর্তৃত্বাদিধর্ম গুণে অর্থাৎ গুণাত্মক অন্তঃকরণে থাকলেও উদাসীন পুরুষ কর্ত্তার মতো প্রতিভাত হন। এইভাবেই অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিম্বপাতে অন্তঃকরণের ধর্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম অন্তঃকরণে আরোপিত হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বাচস্পতি একমুখী প্রতিবিম্বন অর্থাৎ পুরুষের চৈতন্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয় একথা স্বীকার করলেও বিজ্ঞানভিক্ষু দ্বিমুখী প্রতিবিম্বন অর্থাৎ পুরুষ যেমন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয় অন্তঃকরণও তেমনি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় একথা স্বীকার করেন। কিন্তু বাচস্পতি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়েছেন যে, কেবলমাত্র অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিম্বন হয়। তিনি বলেছেন, সরোবরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়াতেই জলগত প্রতিবিম্বে বা চন্দ্রে জলের ধর্ম চঞ্চলতা, মালিন্যাদি আরোপিত হয় এবং চন্দ্রগত প্রকাশত্বাদি ধর্ম জলে আরোপিত হয়। কাজেই জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব স্বীকার করলেই জলে প্রকাশত্ব ধর্মের এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে চাঞ্চল্য-মালিন্যাদি ধর্মের উপপত্তি হয়। কাজেই অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিম্ব স্বীকার করলেই অন্তঃকরণের ধর্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম অন্তঃকরণে আরোপিত হয়। এরজন্য পুরুষে অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই।

বাচস্পতি বলেছেন, দৃষ্টের লক্ষণে 'প্রতি' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা অনুমান ও স্মৃতিজ্ঞানে প্রত্যক্ষের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হয়েছে। 'প্রতি' শব্দটির দ্বারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষকে বোঝানো হয়েছে। অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে কোনও সন্নিকর্ষ স্থাপিত হয় না। অনুরূপভাবে, স্মৃতিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের বেলায় যেরূপ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ থাকে তার অভাব দেখা যায়।

দৃষ্টের লক্ষণের অন্তর্গত 'বিষয়' শব্দটি বিপর্যয় বা ভ্রম থেকে দৃষ্টকে পৃথক করে। কেননা, বিপর্যয় বা ভ্রম হয় অসদ্বিষয়ক, কিন্তু দৃষ্টের বিষয় হয় নিশ্চয়াত্মক।

আবার লক্ষণের অন্তর্গত 'অধ্যবসায়' শব্দটির দ্বারা সংশয়ে দৃষ্টের বা প্রত্যক্ষের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। কেননা সংশয় হল এক ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান। তাই সংশয় জ্ঞান হল অনিশ্চিত। কিন্তু অধ্যবসায় হল নিশ্চিত জ্ঞান, তা সংশয়ের ন্যায় অনিশ্চিত নয়।

সাংখ্যকারিকা- গ্রন্থের ব্যাখ্যার্থে রচিত অপর একটি অন্যতম টীকাগ্রন্থ *যুক্তিদীপিকা*-তে যুক্তিদীপিকাকার প্রথমে সংক্ষেপে নিজমত বলেছেন, পরে প্রতিপক্ষ মত এবং তারপর প্রতিপক্ষ মতের সম্ভাব্য উত্তর প্রত্যুত্তরাদি দেখিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণের মতকেই প্রতিষ্ঠা করার অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের পঞ্চম কারিকায় উল্লিখিত দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণের ব্যাখ্যায় যুক্তিদীপিকাকার *যুক্তিদীপিকা* নামক টীকাগ্রন্থে বলেছেন, বিষয় হল তাই যা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় এবং নিজ নিজ স্বরূপ দিয়ে বিষয়ীকে আকর্ষণ করে অথবা যেগুলিকে উপলব্ধি করা যায়। এই বিষয় হল দুরকম, যথা— বিশিষ্ট এবং অবিশিষ্ট। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ রূপে যাদের আমরা অনুভব করি সেইগুলি হল বিশিষ্ট বিষয় এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ রূপে যাদের আমরা অনুভব করি

সেইগুলি হল অবিশিষ্ট বিষয়। এই অবিশিষ্ট বিষয়গুলি যোগী অর্থাৎ ঊর্ধ্বস্রোতাদের দ্বারা অনুভব সিদ্ধ হয়। যুক্তিদীপিকাকারের মতে, প্রতিবিষয় শব্দটির দ্বারা যা বোঝায় তা হল 'প্রতিটি বিষয়ে যা থাকে'। এখন প্রশ্ন উঠবে প্রতিটি বিষয়ে কি থাকে? এর উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার নিজেই বলেছেন প্রতিটি বিষয়ে যা থাকে তা হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়তে যে অধ্যবসায় তাকেই বলা হয় প্রতিবিষয়াধ্যবসায়। এখন প্রশ্ন হল অধ্যবসায় কাকে বলে? এ বিষয়ে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের ত্রয়বিংশতি সংখ্যক কারিকায় বলেছেন—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগৈশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্।।"

অর্থাৎ অধ্যবসায় তথা অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হল বুদ্ধি। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারটি হল বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ এবং এর বিপরীত অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই চারটি হল বুদ্ধির তামস রূপ। *যুক্তিদীপিকা*-য় বলা হয়েছে,

"বুদ্ধেস্তু ত্রিগুণাত্মকত্বাত্তস্য তস্য গুণস্য প্রকর্ষে তত্তদ্রূপান্তরমুৎপদ্যতে ইতি"।[৯]

অর্থাৎ বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মিকা হওয়ায় এই গুণগুলির উৎকর্ষ হেতু বুদ্ধির বিভিন্ন রূপ উৎপন্ন হয়। যুক্তিদীপিকাকারের মতে, ইন্দ্রিয় যখন বিষয় গ্রহণ করে সেই সময় বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হেতু রজ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে। বুদ্ধির সেই প্রকাশকে বলা হয় দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং এইরূপ বুদ্ধির সাথে চেতনা শক্তির যে সম্বন্ধ তাকে বলা হয় ঐ প্রমাণের ফল।

যুক্তিদীপিকাকার তাঁর *যুক্তিদীপিকা* গ্রন্থে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণে যে অধ্যবসায় পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তার বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গ নিরসনের জন্য দৃষ্টের লক্ষণে অধ্যবসায় পদটির গ্রহণ অপরিহার্য। অধ্যবসায় পদটি দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণে না দিলে দৃষ্টের লক্ষণটি হবে 'প্রতিবিষয়'। এই 'প্রতিবিষয়'-ই প্রত্যক্ষ একথা বললে বিষয়গুলি অনুগ্রাহক-রূপে উপগত হল, নাকি উপঘাতক-রূপে উপগত হলো তা কিছুই বোঝা যেত না।

যুক্তিদীপিকা-য় বলা হয়েছে করণ তেরটি। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের ত্রিবিংশতি সংখ্যক কারিকায় বলেছেন—

"করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধাহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ।।"[১০]

অর্থাৎ করণ তেরটি, যথা— পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও তিনটি অন্তরেন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। এগুলি আহরক, ধারক ও প্রকাশক ভেদে তিন প্রকার। করণের কার্য বা বিষয় দশ প্রকার। এই দশ প্রকার বিষয় আবার আহার্য, ধার্য ও প্রকাশ্য ভেদে তিন প্রকার। এই তেরটি করণের মধ্যে বাহ্যকরণ হল দশটি, যথা— পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। আর অন্তঃকরণ হল তিনটি, যথা— বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন। এই অন্তঃকরণকে বলা হয় দ্বারী এবং অন্যান্য করণগুলি হল দ্বার। প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টের লক্ষণে অধ্যবসায় অর্থাৎ অসাধারণ ব্যাপার বিশিষ্ট বুদ্ধি পদটি সংযোজন না করলে অন্যান্য করণের অর্থাৎ শোত্রাদির মধ্যে যে কোন একটি এবং অন্তঃকরণ তিনটি—মোট চারটি করণ বিষয়ের প্রতি প্রবর্তিত হয়, এরূপ সংশয় দেখা দিত। কেননা যেকোন বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে সেই বিষয়-গ্রাহী ইন্দ্রিয় হল দ্বার এবং অন্ত:করণ তিনটি হল দ্বারী। এখানে দ্বার হল মুখ্য, কেননা

[৯] ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি : *যুক্তিদীপিকা,* পৃ. ২৫৩
[১০] কারিকা-৩২, *সাংখ্যকারিকা*

ইন্দ্রিয়-দ্বারই সাক্ষাৎভাবে বিষয় গ্রহণ করে; এবং দ্বারী হল গৌণ, কেননা অন্তঃকরণ দ্বারী বলে তা সাক্ষাৎভাবে বিষয় গ্রহণ করে না।

এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষগণ বলতে পারেন যে, এ সংশয় দূর হল না বরং থেকেই গেল। কেননা কোন বিষয় গ্রহণের সময় যেকোন একটি করণ কোন বিষয় গ্রহণ করতে পারে না; বরং সবকটি করণ একটি বিষয় গ্রহণ করে থাকে বলে সেই সবকটি করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত। এর উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন— সবকটি করণ বিষয় গ্রহণ করে একথা বললে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। একমাত্র অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তির সাথে চেতনের প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধ ঘটলেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ জানা যায়।

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের ষড়ত্রিংশৎ কারিকায় বলেছেন—

"এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি।।"

অর্থাৎ একটি অপরটি থেকে ভিন্ন হয়েও মন, অহঙ্কার এবং দশটি ইন্দ্রিয়রূপ গুণবিশেষ অর্থাৎ গুণের বিকারসমূহ প্রদীপের মত হয়। কেননা এরা প্রদীপের মত পারস্পরিক সহযোগিতায় পুরুষের সকল ভোগ্যপদার্থ প্রকাশিত করে বুদ্ধিকে সমর্পন করে দেয়। কাজেই বলা যায়, সত্ত্ব, রজ ও তম নামক বিশিষ্ট গুণগুলি তৈল, বর্ত্তিকা ও অগ্নি সংযোগে প্রদীপের মত পরস্পর বিলক্ষণ হয়েও পুরুষার্থ ভোগ ও মুক্তির জন্য বুদ্ধিতেই বিষয়গুলি অর্পণ করে। বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি বিষয় আলোচনা পূর্বক মনকে, মন অহঙ্কারকে এবং অহঙ্কার বিবেচনা সহকারে বুদ্ধিতেই বিষয়গুলি সমর্পন করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, মন কেন বুদ্ধিতেই বিষয়গুলি অর্পণ করে থাকে? এর উত্তরে সাংখ্যকারিকা-র সপ্তত্রিংশতি সংখ্যক কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

"সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্।।"

অর্থাৎ যেহেতু বুদ্ধি পুরুষের জন্য সকল বিষয় ভোগ সম্পন্ন করেন অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়সমূহকে পুরুষের নিকট হাজির করান এবং ভোগ সম্পন্ন হয়ে গেলে সেই বুদ্ধিই প্রকৃতি ও পুরুষের সূক্ষ্ম ভেদ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান প্রকট করে দেন। তাই যুক্তিদীপিকায় বলা হয়েছে, পুরুষের যাবতীয় উপভোগ যেহেতু বুদ্ধিই সাক্ষাৎভাবে সাধন করে, সেই কারণে বুদ্ধিতেই বিষয়গুলি অর্পণ করা হয়। কিন্তু বুদ্ধি অহঙ্কারকে বা অহঙ্কার মনকে সমর্পন করে না। অতএব, করণের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। তাই অন্যত্র যাতে সংশয় না হয় তাই অধ্যবসায় পদটি দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয়েছে। যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন, প্রত্যক্ষের লক্ষণে যদি অধ্যবসায় পদটি দেওয়া না হত, তবে 'প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাকেই কি প্রত্যক্ষ বলা যেত?' এরূপ সন্দেহ অবশ্যই হত। সেই কারণে দৃষ্টের লক্ষণে অধ্যবসায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, অন্তঃকরণ বৃত্তির প্রত্যক্ষত্বের প্রতি সংশয় না হয়ে বাহ্যকরণ শ্রোত্রাদি বৃত্তির প্রত্যক্ষত্বের প্রতি সংশয় হওয়ার কারণ কী? এর উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন, শ্রোত্রাদি বাহ্যকরণগুলি সাক্ষাৎভাবে বিষয় গ্রহণ করে বলে শ্রোত্রাদি বাহ্যকরণবৃত্তি হল মুখ্য এবং অন্তঃকরণ সাক্ষাৎভাবে বিষয় গ্রহণ করে না বলে তা গৌণ। অন্যভাবে বলা যায়, অন্তঃকরণ যেহেতু দ্বারী হয়ে বাহ্যকরণকে দ্বার করে বিষয় গ্রহণ করে তাই তা গৌণ। গৌণ ও মুখ্যের মধ্যে মুখ্যের প্রতিই গুরুত্ব বেশি থাকে। যেমন, গরু বা ছাগল বাহ্যিক অর্থে গৌণ; কিন্তু অনুবন্ধ্যা যাগের উপযোগী 'গরু' এবং অগ্নিষোমীয় যাগের উপযোগী 'ছাগল' যাগভেদে গুরুত্ব-বিবেচনায় এই অর্থে মুখ্য।

এখন প্রশ্ন ওঠে, 'প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি শ্রোত্রাদি বৃত্তি প্রত্যক্ষ' এভাবে যদি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে কি দোষ হয়? এর উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন, এভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ উপপত্তি হতে

পারত; কিন্তু যখন আমরা কারো প্রতি কারো অনুরাগ প্রত্যক্ষ করি তখন সেক্ষেত্রে শ্রোত্রাদি বাহ্যকরণ বৃত্তি থাকে না। পরের অনুরাগ অনুমিত হলেও নিজের অনুরাগ বা সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের বেলায় শ্রোত্রাদি বৃত্তির কোন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়াও যোগীগণ ইন্দ্রিয় ছাড়াও সুখাদি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁদের প্রত্যক্ষেও শ্রোত্রাদি বৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না। তাই শ্রোত্রাদি বৃত্তি কথাটি বাদ দিয়ে অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যাপারকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হয়েছে।

পুনরায় দৃষ্টের লক্ষণে 'প্রতিবিষয়' শব্দটি গ্রহণের যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এর উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেন দৃষ্টের লক্ষণে 'প্রতিবিষয়' শব্দটি গ্রহণের কারণ হল, যা নেই তার নিরাকরণ। 'প্রতিবিষয়' শব্দটি না দিলে প্রত্যক্ষের বা দৃষ্টের লক্ষণটি হত 'অধ্যবসায়ো দৃষ্টম্'। এটিকে যদি দৃষ্টের লক্ষণ বলা হত, অর্থাৎ প্রতিবিষয় শব্দটি না বলা হত, তবে মরীচিকা, অলাতচক্র (রামধনু), গন্ধর্ব নগর, আকাশকুসুম ইত্যাদি যেগুলি প্রকৃত অর্থে নেই অথচ যেগুলির লৌকিক ব্যবহার বিদ্যমান সেইগুলিতে বুদ্ধির ব্যাপাররূপ প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। বস্তুত সেগুলি বিষয় নয় বলে দৃষ্টের লক্ষণে 'প্রতিবিষয়' শব্দটি নিবেশন করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, দৃষ্টের লক্ষণে 'প্রতি' শব্দটি সংযোজনের কারণ কী? 'বিষয়াধ্যবসায়' এইরূপ প্রত্যক্ষ লক্ষণ করলেই তো হত। এর উত্তরে যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন 'বিষয়াধ্যবসায়' এটিকে যদি দৃষ্টের লক্ষণ বলা হত, তবে নিকটে নেই এমন বিষয়েও প্রত্যক্ষ হয়ে যেতো। তাই সন্নিকর্ষ সূচিত করার জন্যই দৃষ্টের লক্ষণে 'প্রতি' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। সুতরাং, বিষয় সন্নিকর্ষেন্দ্রিয় বৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত যে অধ্যবসায় তাকেই বলা হয় দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ।

কিন্তু সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধ্যবসায়কে যদি দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়, তবে সেক্ষেত্রে অনুরাগ-প্রণয়-ভালবাসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রতি উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দেখা দেয়। কেননা অনুরাগাদি বিষয় অতীন্দ্রিয় বলে তা প্রত্যক্ষ হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন, "বিষয়ং বিষয়ং প্রতি প্রতিবিষয়ম্"— এইরূপে নিষ্পন্ন প্রতিবিষয় শব্দটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষণ না হয়ে অধ্যবসায়ের বিশেষণ হোক। যেমন "বিষয়ং বিষয়ং প্রতি যোঽধ্যবসায়স্তদ্ দৃষ্টমিতি"[১১] এইরূপ বললে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের আর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, অনুরাগাদি বিষয় প্রমেয় হতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, যদি তাই হয়, তবে শব্দাদির প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করতে হয়। কেননা শব্দাদির সাথে অন্তঃকরণের সন্নিকর্ষ উপপত্তি হয় না। অথচ 'দৃষ্ট'-এর লক্ষণে 'প্রতি' পদটির দ্বারা সন্নিকর্ষকেই বোঝানো হয়েছে। আবার তাকেই অন্তঃকরণের বিশেষণ বলা হয়েছে। কাজেই শব্দাদির সাথে অন্তঃকরণের সন্নিকর্ষ সম্ভব না হওয়ায় শব্দাদির ব্যর্থতা অনিবার্য। আবার বাহ্যইন্দ্রিয়গুলিকে দ্বার এবং অন্তঃকরণকে দ্বারী বলে যে ঘোষনা করা হয়েছিল সেই দ্বার-দ্বারীভাব না থাকায় শাস্ত্রহানিও অনিবার্য। কাজেই বলা যেতে পারে, বহুদূরে এসেও প্রত্যাখ্যানবশত প্রতিগ্রহণকে ছাড়া যায় না রাগাদি বাদ পড়ছে বলে।

যুক্তিদীপিকাকার এর উত্তরে বলেছেন "অস্তু তর্হীন্দ্রিয়াণাং প্রতি বিষয়গ্রহণং বিশেষণম্"।[১২] অর্থাৎ প্রতিবিষয়গ্রহণটি তবে ইন্দ্রিয়েরই বিশেষণ হোক। তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণটি রাগাদিতে সন্নিবিষ্ট না হওয়ায় যে আপত্তি উঠেছে তার খণ্ডণে যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন "একশেষনির্দেশাৎ সিদ্ধম্"[১৩] অর্থাৎ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস করলেই রাগাদিতে প্রত্যক্ষের লক্ষণটি সিদ্ধ হবে। যেমন, "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়শ্চ প্রতিবিষয়াধ্যবসায়শ্চ

[১১] ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি : *যুক্তিদীপিকা*, পৃ. ৯৬
[১২] ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি : *যুক্তিদীপিকা*, পৃ. ৯৭
[১৩] ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি : *যুক্তিদীপিকা*, পৃ. ৯৭

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়"[১৪] এইরূপে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি প্রতিবিষয়াধ্যবসায়-এর দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের এবং অন্য প্রতিবিষয়াধ্যবসায়-এর দ্বারা অন্তরঙ্গ প্রাতিভের পরিগ্রহ হওয়ায় রাগাদি বিষয় এবং যোগীগণের যে বিজ্ঞান সমস্ত কিছুই সংগৃহীত হয়ে যায়। যুক্তিদীপিকা-র এরূপ ব্যাখ্যা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ লক্ষণের এরূপ অভিনব ব্যাখ্যা সাংখ্যশাস্ত্রের অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি।

এইরূপেই আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক বিরচিত *সাংখ্যকারিকা*-র অন্যতম টীকাগ্রন্থ বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* এবং অজানা লেখক রচিত টীকা *যুক্তিদীপিকা*-য় *সাংখ্যকারিকা*-র পঞ্চম কারিকায় বর্ণিত দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণটির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ:

দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ মূলত দুই প্রকার। যথা— নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের অষ্টবিংশতি কারিকায় বলেছেন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হল আলোচন জ্ঞান বা নির্বিকল্পক জ্ঞান। *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের উপর রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*-তে বাচস্পতি মিশ্র অষ্টবিংশতি কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—আলোচন শব্দের অর্থ হল সম্মুগ্ধবস্তুদর্শন। আলোচন বা সম্মুগ্ধজ্ঞান বলতে বোঝায় বিশেষপরিচয়-রহিত সামান্যজ্ঞান। যেমন, দূর থেকে একটি বস্তুকে দেখা গেল; কিন্তু ঐ বস্তুটি কি মানুষ অথবা বৃক্ষ তা নির্ণীত হল না। এইরূপ জ্ঞানকে বলা হয় চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য আলোচন জ্ঞান। সাংখ্যমতে এইরূপ সামান্যজ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর বিশেষজ্ঞান হয় না, তা হয় মনের দ্বারা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসাস্বাদন এবং গন্ধগ্রহণ রূপ আলোচন হয়। অনন্তর তৎ তৎ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত মন ঐ বিষয়ের বিশেষ অবধারণ করে।

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*- গ্রন্থের সপ্তবিংশতি কারিকায় মনের পরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন— মন উভয়াত্মক ও সঙ্কল্পাত্মক। বাচস্পতি মিশ্র *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*-তে সপ্তবিংশতি কারিকার ব্যাখ্যায় বলেছেন— মন যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্যের সহায়ক তেমনি কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যেরও সহায়ক। সঙ্কল্পক রূপটিই হল মনের লক্ষণ। এখন প্রশ্ন হল, সঙ্কল্প শব্দের অর্থ কি? এর উত্তরে বাচস্পতি বলেছেন— ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সম্বন্ধ হলে প্রথমে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানে বস্তুর স্বরূপমাত্রই বিষয় হয়, বিশেষ্যবিশেষণভাবাদি বিষয় হয় না। এই জ্ঞানকে বলা হয় সম্মুগ্ধ জ্ঞান, যা নির্বিকল্পক স্থানীয়। এই জ্ঞান মনের ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না। আলোচনাত্মক জ্ঞান বা সম্মুগ্ধ জ্ঞানের পরক্ষণে যে মনের ব্যাপার হয়, সেই ব্যাপারের নামই সঙ্কল্প। দর্শনান্তরের পরিভাষা আশ্রয় করে বলা যায় যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানটি অর্থাৎ আলোচনাত্মক জ্ঞানটি হল নির্বিকল্পক স্থানীয় এবং সঙ্কল্পাত্মক জ্ঞানটি হল সবিকল্পক স্থানীয়। মন স্বীকার না করলে অর্থাৎ মনের সঙ্কল্পরূপ ব্যাপার স্বীকার না করলে সবিকল্পক জ্ঞানের উপপত্তি হয় না।

অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে যথার্থ প্রত্যক্ষ রূপে স্বীকার করায় 'নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ' এই মত সাংখ্য দর্শনে অভিপ্রেত নয়। যাবতীয় সংশয় এবং সম্ভাবনার নিবৃত্তি না হলে বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মায় না। প্রত্যেকটি বস্তু নিজের অসাধারণ ধর্মের দ্বারা যুক্ত হয়েই সেই বস্তু বিষয়ে যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটায়।

সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযোগের পর নিশ্চয় বা বুদ্ধিব্যাপার পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়টি সংযুক্ত হলে বিষয়ের শুদ্ধস্বরূপ অন্তঃকরণে ভেসে ওঠে। একেই বলে নির্বিকল্পক জ্ঞান। তারপর মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ব্যাপারের দ্বারা বিষয়টিকে বিতর্কিত করে।

[১৪] ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি : *যুক্তিদীপিকা*, পৃ. ৯৭

অতঃপর অভিমান বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয়তার উপক্রম করে এবং তারপর বুদ্ধি ব্যাপারটিকে 'ইহা এই' বলে নির্দিষ্ট করে।

কাজেই *সাংখ্যকারিকা*-য় বর্ণিত প্রত্যক্ষের লক্ষণ থেকেই বোঝা যায় যে, সাংখ্য দর্শনে নিশ্চয়াত্মক প্রমারূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে স্বীকার করায় এই দর্শনে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পাশাপাশি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের যাথার্থও স্বীকৃত হয়েছে।

উপসংহার:

একটি ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত প্রমাণসমূহ তার সকল প্রমেয়সিদ্ধির উপযোগী হওয়া আবশ্যক এবং বিপরীতভাবে ঐ দর্শনের সকল প্রমেয়সিদ্ধি তার স্বীকৃত প্রমাণসমূহের দ্বারা হওয়া আবশ্যক। কারণ, "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধিঃ"। বস্তুত প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়সিদ্ধি না হলে মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে প্রতিটি ভারতীয় দর্শনের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রমাণতত্ত্ব রয়েছে। সাংখ্য দর্শনেরও তাই তার সকল প্রমেয়সিদ্ধির উপযোগী নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রমাণতত্ত্ব আছে।

সাংখ্য দর্শনে যে তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত সেই তিনটি প্রমাণের মধ্যে অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য অনেক বেশি। কেননা, অনুমান প্রমাণ এবং শব্দ বা আগম প্রমাণ সাক্ষাৎ ভাবেই হোক বা পরোক্ষ ভাবেই হোক প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। অনুমানের অসাধারণ কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং শাব্দবোধের অসাধারণ কারণ পদজ্ঞান—এদের মূলে যেকোন ভাবে একটি দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এক কথায় বলা যায়, দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল ভিত্তিস্বরূপ। এই কারণেই ভারতীয় দর্শনের সকল দার্শনিক সম্প্রদায় এমনকি সাংখ্যদার্শনিকগণও প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষকে প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে প্রথমে স্থান দিয়েছেন। সাক্ষাৎভাবে স্থূল-ব্যক্ততত্ত্ব-সিদ্ধির অনুকূল হলেও পরম্পরাগতভাবে সর্বপ্রমাণমূল-রূপে প্রত্যক্ষ সাংখ্যস্বীকৃত সকল প্রমেয়সিদ্ধির উপযোগী হওয়ায় সাংখ্য দর্শনে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপরিহার্যতা সিদ্ধ তথা প্রমাণিত হয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধটিতে *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের ব্যাখ্যার্থে বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* ও অজানা লেখক রচিত টীকা *যুক্তিদীপিকা*-কে অবলম্বন করে সাংখ্যদর্শনের সর্বপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থ *সাংখ্যকারিকা*-য় বর্ণিত দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে সাংখ্যদর্শনের সর্বপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থ *সাংখ্যকারিকা*-য় বর্ণিত দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি যৌক্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারণা আমরা লাভ করতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. দিবাকরানন্দ, স্বামী (১৯৭৬)। শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীতা সাংখ্যকারিকা। প্রকাশক—গণেশ চন্দ্র দত্ত, ৩৪, সদানন্দ রোড। কলকাতা।
2. বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য। পূর্ণচন্দ্র (১৯৮৩)। সাংখ্যকারিকা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। কলকাতা।
3. ভট্টাচার্য্য, রজত (২০১১)। সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। (প্রথম খণ্ড)। প্রগতিশীল প্রকাশক। কলকাতা।
4. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র (১৯৯৪)। *শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা* সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলকাতা।
5. ভাবঘনানন্দ, স্বামী। (২০০০)। সাংখ্যকারিকা। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকা...
6. ন্যায়াচার্য্য, হরিরামশুক্ল। (১৯৩৭)। শ্রী ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিতা সাংখ্যকারিকা ষড়্‌দর্শনটীকাকৃদ্বাচস্পতি-মিশ্রবিরচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সহিতা। কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ-পুস্তক-মালা, ১২৩। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ. বেনারস।
7. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ (সপ্ততীর্থ)। (১৯৮৪)। সাংখ্য দর্শনের বিবরণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
8. ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি। (১৪১১ বঙ্গাব্দ)। যুক্তিদীপিকা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. কলকাতা।
9. Sen Gupta, Anima (1959). Classical Sāṁkhya: A critical study. 1st edn. Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. Delhi
10. Chakravarti, Pulinbihari (1975). Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought, 2nd edn. Oriental Books Reprint Corporation. New Delhi
11. Kumar, Shiv and D. N. Bhargava (1990). Yuktidīpikā, Vol. I. 1st edn. Eastern Book Linkers. Delhi